7

লোকপাল
Vigilance

জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা কেন জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন না, সে প্রশ্ন বারবার দেখা দিয়েছে। আর এই জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা বাড়াতেই আমাদের দেশে লোকপাল বিলটির অবতারণা। বিলটির মোদ্দা কথা হল, দেশের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখবে লোকপাল নামক একটি স্বাধীন তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান। অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধানও দেওয়া যাবে এই প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায়।

সরকারী মহলে ক্ষমতা ও দুর্নীর্তির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। রাজতন্ত্রে বা সামরিক শাসনে শাসকরা আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে থাকে ; এটা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের জনপ্রতিনিধিদের নামও যখন একের পর এক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে তখন গণতন্ত্রের উচ্চ আদর্শগুলি প্রহসনে পরিণত হয়। জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা কেন জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন না, সে প্রশ্নও বারবার উঠেছে। আর জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা বাড়াতেই আমাদের দেশে লোকপাল বিলটির উত্থাপন। লোকপাল বিলটির মোদ্দা কথা হল যে, দেশের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীর্তির অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখবে লোকপাল নামক একটি স্বাধীন তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান। অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া যাবে এই প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায়। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই কিন্তু এই বিলটি একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে পড়েছে।

জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিতে লাগাম টানতে একটি তদন্তভিত্তিক বিচারকেন্দ্র গড়ে তোলার ধারণাটি কিন্তু মোটেই নতুন নয়। 1809 সালে ওমবাডসম্যান (Ombudsman) নামক একজন তদন্তকারী আধিকারিকের নিয়োগের প্রথা চালু করা হয়। এই ওমবাডসম্যান নিয়োগের ঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিল শাসক ও বিচারকদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি ও অপশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের সত্যাসত্য খতিয়ে দেখা। এই আধিকারিকদের নিয়োগের দায়িত্ব পায় আইনসভা। মোটামুটিভাবে দেশে রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই ওমবডসম্যান নিয়োগ করার রীতি ছিল। ওমবাডসম্যান নিরপেক্ষভাবে তদন্তের কাজ চালিয়ে আইনসভার কাছে রিপোর্ট পেশ করতেন। কখনও দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, আবার কখন কোন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিজেরাই

উদ্যোগী হয়ে তদন্তের কাজ শুরু করতেন। শুধু সুইডেনেই নয়, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়েতেও এই ওমবাডসম্যান নিয়োগের প্রথা এখনও বজায় রয়েছে। ওমবাডসম্যান না হলেও খানিকটা সে ধরনের একটি পদ রয়েছে ব্রিটেনে, যার নাম "পার্লামেন্টারী কমিশনার"। তবে তিনি শুধুমাত্র আইনসভার সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করতে পারেন। ওমবাডসম্যান বা পার্লামেন্টারী কমিশনারের মতো তদন্তকারী পদাধিকারীরা নিজের অথবা যেকোনও সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারেন। সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর দোষী জনপ্রশাসকদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওমবাডসম্যানদের হাতে। অথচ তিনি ডেনমার্কে ততটা ক্ষমতাশালী নন। সেখানে তিনি শুধু শাস্তির সুপারিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রাখতে পারেন। কিন্তু তা কার্যকর করার ক্ষমতা তাদের নেই। তবে এই ধরনের পদাধিকারীর যে ব্যাপক প্রচার পান সেটাই তাদের শক্তি ও ক্ষমতার প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তি পান বা না পান, তাদের নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে যে ধরনের প্রচার হয় তাতে এমনিতেই জনসমক্ষে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। আর এতে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা কিছুটা ধাক্কা খায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে প্রস্তাবিত লোকপাল পদটিকে ওমবাডসম্যানেরই ভারতীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। যদিও প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী লোকপালের ক্ষমতাও এক্তিয়ার অনেকটাই বেশী।

60-এর দশকের শুরু থেকেই ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও জনপ্রতিনিধিদের সম্বন্ধে নানা রূপ দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে থাকে। সেই সময়কার ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার এই সর্বব্যাপী দুর্নীতি রোধ করতে ওমবাডসম্যানের আদলে 'লোকপাল' পদটি তৈরীর কথা ভাবতে থাকে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনতে গঠিত প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন, 1966 (Administrative Reform Commission) জনস্তর বিশিষ্ট একটি তদন্তকারী প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার সুপারিশ করে। কেন্দ্রীয়স্তরে "লোকপাল" ও রাজ্যস্তরে "লোকায়ুক্ত" নামক দুটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ ছিল এই কমিশনের রিপোর্টে। এই সুপারিশ মেনে দেশের 17 টি রাজ্যে লোকায়ুক্ত নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়। জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতি রুখতে এবং জনগণের কাছে দ্রুত অথচ সুলভে ন্যায়বিচার পৌঁছে দিতে এই ধরনের নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প থাকতে পারে না। তাই তড়িঘড়ি লোকপাল বিলটির খসড়াও তৈরি করে ফেলা হয়। প্রস্তাবিত বিলটি চতুর্থ মেয়াদকালে (1986) সংসদে পেশ করা হয়। 1969 সালে লোকসভায় বিলটি পাসও হয়ে যায়। এরপর রাজ্যসভায় অনুমোদনের জন্য বিলটি পাঠানো হয়। কিন্তু এরপরই দেখা দেয় ঘোরতর আপত্তি। রাজ্যসভায় বিলটি পাস হওয়ার আগেই লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ফলে আত্মপ্রকাশের আগেই বিলটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। পরে অবশ্য ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারীর কথা

মাথায় রেখে বিলটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। বিলটি আটবার সংসদে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়। 2001 সালে বিলটি শেষবারের মত সংসদে আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। কিন্তু প্রতিবারই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের অভাবে আস্থাকাল বিলম্ব হতে থাকে। বর্তমান লোকসভাতেই বিলটি পাশ হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

বিলটির বিষয়বস্তু ঃ ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গেছে যে জনপ্রতিনিধিদের বিশ্বাসযোগ্যতা কমতে থাকে। একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারী দেখা যায়। তার ফলে সরকার, নির্বাচন এমনকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর থেকে আস্থা হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় স্তরে জনপ্রতিনিধি ও শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই লোকপাল নামক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ মেনে বিগত কয়েক বছরে লোকপাল বিলের খসড়ায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

লোকপাল গঠন ঃ লোকপাল মূলতঃ তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্তকারী সংস্থা। সংস্থার শীর্ষে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বা বর্তমান বা প্রধান বিচারপতি বা যে কোন সহকারী বিচারপতি থাকতে পারেন। রাজ্য হাইকোর্টের যেকোন দুজন বর্তমান বা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বা সহকারী বিচারপতি, বাকী দুই সদস্যপদে মনোনীত হওয়ার যোগ্য। সংস্থার সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ করতে পারবেন রাষ্ট্রপতি। উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার স্পিকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী সংসদের যে কক্ষের নেতা সেটি ছাড়া অন্য কক্ষটির নেতা ও সংসদের দুইকক্ষের বিরোধী দলনেতাদের নিয়ে গঠিত কমিটি এই সংস্থার সদস্যদের নাম প্রস্তাব করবেন।

লোকপালের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা

লোকপালের মত সম্মানীয় পদটিকে রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য বেশ কিছু রক্ষাকবচের বন্দোবস্ত রয়েছে প্রস্তাবিত বিলটিতে। যেমন,

(1) লোকপালের নিয়োগ শুধুমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশেষ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই হতে হবে। শাসকদল বা জোট এক্ষেত্রে একতরফা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

(2) লোকপাল পদে নিযুক্ত হওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীরা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

(3) প্রমাণিত অসদাচরণ ও অক্ষমতার অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পদাধিকারীদের অপসারণ করা যেতে পারে।

(4) দুর্নীতির তদন্ত চালানোর জন্য লোকপালের একটি নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকবে।

(5) লোকপালের বেতন ও ভাতা ভারতের সঞ্চিত তহবিলের (Consolidated Fund of India) ওপর ধার্য ব্যয় বলে গণ্য হবে।

লোকপালের এক্তিয়ার ঃ প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয়মন্ত্রীসভার যে কোন সদস্য সংসদসহ কেন্দ্রীয় স্তরে সব রাজনৈতিক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পারেন লোকপাল। প্রধানমন্ত্রীর কোন আচরণ জাতীয় নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের ক্ষতি করছে—এমন অভিযোগ উঠলে, তবেই লোকপাল সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পারেন। জনপ্রশাসক (Public Servant) ছাড়া যে কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেনা। তবে একটি কাজ সম্পাদনের দশ বছরের মধ্যে সে সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে তা দায়ের করা যেতে পারে। দশ বছরের বেশী পুরানো কাজের অভিযোগ বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে লোকপাল তদন্তের কাজ শুরু করবেন। লোকপালকে দেওয়ানি আদালতের সমতুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রস্তাবিত বিলের খসড়ায়। আর সেই ক্ষমতার ভিত্তিতে তিনি কোন ব্যক্তির কাছে হাজিরা দেওয়ার সমন পাঠাতে পারেন। অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ সহ রিপোর্ট পাঠাবেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে। লোকপাল প্রয়োজনে, খানাতল্লাসি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও জারি করতে পারেন। তবে তাকে প্রতি বছর তার কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে হবে।

প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী লোকপাল শুধু জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগগুলির তদন্ত করতে পারেন। প্রশাসকদের অপকর্মন্যতা বা অপশাসনের ফলে জনগণের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধলেও সে সম্পর্কে কোন অভিযোগ খতিয়ে দেখার ক্ষমতা লোকপালকে দেওয়া হয়নি।

গণতন্ত্রে জনসাধারণের সুবিচার পাওয়ার শেষ আশা বিচার বিভাগ। কিন্তু অধস্তন বিভিন্ন আদালত, এমনকি হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যেও বর্তমানে যেভাবে দুর্নীতি বাসা বাঁধছে তাতে সাধারণ মানুষ বিচারবিভাগের উপরও আর সে ভাবে আস্থা রাখতে পারছে না। তাই UPA সরকার বিচারবিভাগকেও লোকপালের আওতায় আনতে আগ্রহী।

বিতর্কের কারণ ঃ জন্মের পর থেকেই একের পর এক বিতর্ক তাড়া করে ফিরছে এই বিলটিকে। বিলে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলিতে নিয়ে এখনও কোন চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌছানো যায়নি। প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে লোকপালের বিচার ক্ষমতায় রাখা উচিৎ হবে কি না, তা নিয়ে সবচেয়ে বেশী বিতর্ক। নীতিগতভাবে অন্য সব প্রতিনিধিদের মত প্রধানমন্ত্রীর পদটিও লোকপালের আওতায় থাকা উচিত। কারণ আমাদের সংবিধান আর আইনের অনুশাসনে বলে 'কোন নাগরিকই আইনের উর্ধ্বে নয়, তার পদমর্যাদা যাই হোক না কেন'। এই যুক্তি মেনে অসদাচরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীরও শাস্তি প্রাপ্য। আবার ভিন্নমতাবলম্বীরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির মত সম্মানীয় পদকে সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের সমগোত্রীয় না করাই উচিত। প্রধানমন্ত্রীর পদকে লোকপাল নামক তদন্তকারী

আধিকারিকের আওতাভুক্ত রাখলে বিশ্বের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পদকে লোকপালের তদন্তের আওতায় রাখার সপক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। এমনকি রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম রাষ্ট্রপতির পদটিকেও লোকপালের এক্তিয়ারভুক্ত করার পক্ষপাতি।

এছাড়াও প্রস্তাবিত বিলটিতে এমন কিছু বিষয় আছে যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী, যেমন এই বিলে বলা হয়েছে যে, লোকপালের তদন্ত চলাকালীন সময়ে সে সম্বন্ধে সংবাদ মাধ্যমে কোন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।

প্রস্তাবিত বিলে লোকপালের কর্মপদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। খাতায় কলমে লোকপালের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার মহান আদর্শের কথা বার বার বলা হলেও বাস্তব চিত্রটি ঠিক উল্টো। কারণ লোকপালকে তাঁর তদন্ত কাজের জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত তদন্ত সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। আর এই সংস্থাগুলির রাজনৈতিক চরিত্র কারও অজানা নেই। সাম্প্রতিককালে সি. বি. আইকে তার পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য বেশ কয়েকবার সুপ্রীম কোর্টের ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে। এছাড়া লোকপাল কতখানি আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করতে পারবেন বা কতটা স্বশাসন পাবে তার উপরও এই পদটির কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তা না হলে এটিও সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বা অন্যান্য তদন্তসংস্থাগুলির মত হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যস্তরের লোকায়ুক্তর অক্ষমতার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির 1965-এর সুপারিশ মেনে 17 টি রাজ্যে লোকায়ুক্ত নামক তদন্তমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ নেয় ওড়িষ্যার রাজ্য সরকার। 1971 সালে সে রাজ্যে গঠিত হয় লোকায়ুক্ত। তবে লোকায়ুক্তের ক্ষমতার পরিধি সব রাজ্যে সমান নয়। কোন কোন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীসহ সমস্ত জনপ্রতিনিধিকেই লোকায়ুক্তের এক্তিয়ারের মধ্যে রাখা হয়েছে, আবার কর্ণাটকের মত অনেক রাজ্যে আইন সভার সদস্যদের সযত্নে লোকায়ুক্তের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। লোকায়ুক্তের অধীনে কোন নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থা নেই। ফলে প্রতি পদে পদে রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তি ও আমলাদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হন লোকায়ুক্ত পদাধিকারীরা। এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব হয় না। অথচ এর জন্য রাজ্যের অর্থভাণ্ডার থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গেছে এই ধরনের পদগুলিকে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে অবসরপাপ্ত বিচারপতিদের পুরস্কৃত করার কাজেই ব্যবহার করা হয়।

লোকপাল বিলের আরও একটি বিষয়কে সমর্থন করা যায় না। এখানে অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হলে অভিযোগকারীকে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে। জনপ্রতিনিধিরা যাতে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতেই লোকপাল গঠনের উদ্যোগ। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থতার জন্য যদি আর্থিক জরিমানা বা কারাবাসের মত শাস্তির

সম্মুখীন হতে হয় তাহলে অভিযোগ দায়ের করতে যে কেউই এগিয়ে আসবে না, তা ধরে নেওয়া যায়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পদাধিকারীদের জনগণের আস্থা ফেরাতে দেশে লোকপালের মত কর্তৃপক্ষের যে প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটি জাগছে এর কার্যকারিতা নিয়ে। এই বিলটিকে নিয়ে যখন সব রাজনৈতিক দলই নীতিগতভাবে একমত তখন এটিকে নিয়ে কালবিলম্ব কেন করা হচ্ছে সে উত্তরও সবার জানা। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি রন্ধ্রে যেভাবে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তাতে সব রাজনৈতিক দলই অস্বস্তিতে রয়েছে। রাজনৈতিক পদাধিকারীদের সদিচ্ছা থাকলেই লোকপাল পদটিকে দায়িত্বশীল ও কার্যকরী করে তোলা যায়। শুধু বিধিবদ্ধ ক্ষমতায় কাজ চলবে না। লোকপালের হাতে শাস্তির নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা দিতে হবে।